গড়ে উঠবে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়

মোস্তাফা জব্বার

অবশেষে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের খসড়া আইনটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে আরও একটি সিঁড়ি অতিক্রান্ত হলো। সেদিন মিডিয়া যে খবরটি প্রকাশ করে তাতে এটি বলা হয়, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হবে। মন্ত্রিপরিষদবিষয়ক সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসেন ভূঁইয়া জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির সাথে বঙ্গবন্ধুর নাম যুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি গাজীপুরে স্থাপিত হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গীকারের সাথে যত স্বপ্ন যুক্ত আছে, তার একটি হলো একটি বিশ্বমানের শ্রেষ্ঠতম ডিজিটাল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাকারী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই সেই স্বপ্নটা প্রকাশ করি আমি। এটি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজও শুরু করি। তখন প্লাটফরম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি।

পূর্বকথা

প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। শুধু তাই নয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাও ওখান থেকেই এসেছে। অনেকেই জানেন না, ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগানটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জনগণের সামনে প্রথম উপস্থাপন করেছিল বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। ২০০৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি বাংলা একাডেমির বইমেলায় তাদের স্টলে স্লোগান দিয়েছিল 'একুশের স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ'। এটি নিয়ে আমি লেখালেখি করি ২০০৭ সাল থেকে। দৈনিক সংবাদ, দৈনিক করতোয়া, মাসিক কমপিউটার জগৎ এসব পত্রিকায় আমার ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা ও কর্মসূচি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে হংকংয়ের অ্যাসোসিও সামিটে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি হিসেবে আমি এর ওপর একটি উপস্থাপনা পেশ করেছিলাম। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়টি লেখার কাজটিও আমার করা। আওয়ামী লীগের হয়ে প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশ সেমিনারের মুখ্য আলোচকও আমিই ছিলাম। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির তথ্যপ্রযুক্তি মেলাগুলোর স্লোগান ছাড়াও আয়োজিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশ সামিট। ফলে সংগঠন হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটির পতাকা এই সংগঠনটিই বহন করেছে।

বলা যায়, সেই সূত্র ধরেই ২০০৯ সালে যখন এই সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসে তখন আমরা বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির পক্ষ থেকে অন্য অনেক কাজের মধ্যে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবনাটি পেশ করি। তৎকালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমানের সাথে পুরো বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির প্রস্তাবে সম্মতি দেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ২০০৯ সালের ২৭ আগস্ট সদ্য বন্ধ করা রূপসী বাংলা হোটেলে তার মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্ম সচিব নিয়াজের সাথে আমি একটি সমঝোতা স্মারক সই করি। ইয়াফেস ওসমান নিজেও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সমঝোতা স্মারকে প্রধান দুটি বিষয় ছিল : ০১. ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহায়তা করা এবং ০২. আন্তর্জাতিক মানের একটি আইসিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

সেই সমঝোতা স্মারক অনুসারে মন্ত্রণালয় ঢাকার কালিয়াকৈরে ৫ একর জায়গা দেবে এবং বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি তহবিল সংগ্রহ করবে এমন সিদ্ধান্ত ছিল। বিষয়টি নিয়ে এরপর আরও অনেক আলোচনা হয়েছিল। আমি, স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ও গাজীপুরের এমপি বর্তমান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথেও দেখা করি। প্রধানমন্ত্রীকে আমার ধারণার কথা বলেছি। সেই সভায় গাজীপুরের ডিসিও ছিলেন। খুব দ্রুত এর উদ্বোধন হবে তেমন কথাও ছিল। আমরা কোরিয়া থেকে শতকরা মাত্র .৫ ভাগ সুদে ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিলও জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু আইনী বাধার কারণে সরকারের সাথে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেনি। সরকারের পিপিপি বিধান থাকলেও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোনো উপায় ছিল না। অন্তত মন্ত্রণালয় থেকে তেমন কথাই আমাদেরকে বলা হয়েছিল। তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে কোরিয়াকে মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব গ্যারান্টি দিতেও সম্মত হননি। বাধ্য হয়েই কমপিউটার সমিতি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ায়। তবে ভালো বিষয় হলো প্রকল্পটি সরকার গ্রহণ করে।

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কী করতে চেয়েছিলাম

যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে ভাবি, তখন পুরো ভাবনাটির একটি বড় অংশ ছিল ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। আমি চেয়েছি কৃষি ও শিল্পযুগের শিক্ষাকে ডিজিটাল যুগে পৌঁছাতে। প্রকৃতপক্ষে আমি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙ্গার চেষ্টা করছি বহু বছর ধরে। বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতি যে আজকের দিনের উপযুক্ত নয়, সেই কথাটি সুযোগ পেলেই আমি বলি। এজন্য শিশু শিক্ষা স্তরে কিছুটা কাজও করেছি আমি। সেই '৯৯ সালে আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। দেশজুড়ে সেই স্কুলের প্রসারও হয়েছে। সেই ধারণাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে যাচ্ছি। বিজয় ডিজিটাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান আমি স্থাপন করেছি শিক্ষাকে ডিজিটাল করার জন্য। এখন সেই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করছে আর ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করতে স্কুলগুলোকে সহায়তা করছে। তবে এসব কর্মকাণ্ড সীমিত রয়েছে শিশুদের মাঝে। আমার স্কুলগুলো প্রাথমিক স্তর থেকে যাত্রা শুরু করে। কোনোটি এখন মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছেছে বটে। তবে উপরের শ্রেণিগুলোর ডিজিটাল রূপান্তর তেমনভাবে হয়নি। শুধু কমপিউটার শিক্ষাটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাদের পাঠ্যবই সফটওয়্যারে পরিণত হয়নি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসবের কোনো ছোঁয়াই লাগেনি। এজন্য ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নটি ছিল উচ্চশিক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকে নিশ্চিত করা। একই সাথে এমন একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা, যেখান থেকে ডিজিটাল শিক্ষার সব উপাদান সৃষ্টি করা হবে। বড় স্বপ্ন ছিল ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় নামে দেশের সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশ্বের সেরা দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতে রূপান্তর করার ইচ্ছাও ছিল।

গাজীপুরের চন্দ্রার মোড়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রি কলেজের জায়গাতেই শুরু হওয়ার কথা ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। জায়গাটি এখন পরিত্যক্ত। এর আশপাশে সরকারি জায়গাও আছে, যেগুলো বেদখল হয়ে আছে। কথা ছিল সব মিলিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হবে। আমার পরিকল্পনা ছিল এর স্থাপত্য হবে বাংলাদেশের সেরা। আমরা চেয়েছিলাম ওই জায়গাটির প্রতি ইঞ্চি মাটি তারবিহীন নেটওয়ার্কভুক্ত থাকবে। ওখানে যে যাবে সে-ই বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে আবাসিক। এর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী– সবাই ওখানেই বসবাস করবেন এবং সবাই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকবেন। প্রতিটি ক্লাসরুম, হলরুম, বসার ঘর, খাবার ঘর, ছাত্রাবাস, শিক্ষক কোয়ার্টার, লবিতে থাকবে বড় পর্দার মনিটর/টিভি। তাতে থাকবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা। এর পাশাপাশি থাকবে ইন্টারনেট কিয়স্ক। সব ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার থাকবে বহনযোগ্য ডিজিটাল যন্ত্র। সব পাঠ্য বিষয় হবে ডিজিটাল। সব বিষয়কে ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারে রূপান্তর করে সেটি পাঠদানের পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। কাগজের বইকে ডিজিটাল সফটওয়্যারে রূপান্তর করে সেই বই রেফারেন্স হিসেবে পাঠ্য করা হবে। ইন্টারনেটের গতি হবে কমপক্ষে ১ গিগাবিটের। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা হবে অনলাইন। খাবারের ব্যবস্থা থেকে ঘর পরিষ্কার করা পর্যন্ত সব কাজের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি হবে তথ্যপ্রযুক্তিতে। সব ▸

পাবলিক প্লেসে বিরাজ করবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ চলবে সব পাবলিক স্থানে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার জন্য যতটা সম্ভব ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। তালার বদলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা চোখের মণি মেলানোতেই অ্যাক্সেস থাকবে। ওখানে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ইতিহাস নিয়ে একটি জাদুঘর গড়ে তোলার ইচ্ছাও ছিল। বস্তুত এটি হবে ডিজিটাল শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের সেরা গবেষণার কাজগুলো এখানেই হবে। এর নামের সাথে বঙ্গবন্ধুর নামটি যুক্ত করার প্রস্তাবও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতিই করেছিল। আ ক ম মোজাম্মেল হক এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সাথে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা করার বিষয়টিও প্রস্তাব করেছিলেন। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তরের নেতৃত্ব দেবে এটি। একই সাথে ডিজিটাল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানটিই হবে। ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত, গবেষণা, প্রয়োগ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ সব কিছুতেই এটি নেতৃত্ব দেবে।

আমরা এটি ভাবিনি, এটি শুধু একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে বা একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এতে শুধু কমপিউটার বিজ্ঞান, ইলেকট্রিক্যাল-ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি পড়ানো হবে, তেমন ভাবনাও আমাদের ছিল না। এখানে সব বিষয়ই পড়ানো হবে। বরং আমরা ভেবেছিলাম এটিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ডিজিটাল অবয়বটি দেখবে। প্রস্তাবনার শুরুতেই আমরা একে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক গবেষণার বাইরে একটি শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেও দেখে আসছি। আমার আরও একটি ধারণা ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ঘিরে। আমি চেয়েছিলাম আমাদের পাহাড়ি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিশু শিক্ষার জন্য তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষামূলক সফটওয়্যার তৈরি করবে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। তারা প্রধানত বাংলা মাধ্যম স্কুলে লেখাপড়া করে। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা না হওয়ার ফলে তারা এসব স্কুলে এসে ভাষাগত সমস্যায় পড়ে। শৈশবে যদি তারা তাদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করতে পারে, তবে সেটি তাদের জন্য একটি বিশাল সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আমরা এরই মাঝে যেসব শিক্ষামূলক সফটওয়্যার তৈরি করেছি, সেগুলোকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় রূপান্তর করার কাজটি করতে পারে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরা এটাও ভেবেছি, এখানকার ক্লাসগুলো দেশের বা দেশের বাইরের যেকোনো স্থান থেকে নেয়া যাবে। আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যেকেউ যেকোনো প্রান্ত থেকে যোগ দিতে পারবে।

আমাদের বড় ভাবনাটি ছিল এরকম, দুনিয়াজুড়ে ডিজিটাল লাইফস্টাইলের যে ধারণা ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে, তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত বহন করবে এই প্রতিষ্ঠানটি। এখানকার রুম-বাড়ি-ঘর ব্যবহার করবে দুনিয়ার সর্বশেষ ডিজিটালপ্রযুক্তি। এখানকার মানুষদের জীবনযাপন-সামাজিক যোগাযোগ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-কেনাকাটা সবকিছুই হবে ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর। নতুন যত ডিজিটাল লাইফস্টাইল পণ্য উদ্ভাবিত হবে, তার প্রথম টেস্ট করার জায়গা হবে এটি। এরপর সেটি হয় প্রয়োগ করা হবে, নয়তো বাতিল করা হবে।

সরকারের প্রস্তাবনা

২৩ ফেব্রুয়ারি এবং ৫ মার্চ ২০১৪ শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে দুটি সভা করে তাতে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি নিয়ে আলোচনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া আইনটিও অনুমোদিত হয়। সেটি নানা স্তর পার হয়ে ২৯ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার অনুমোদন পায়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র কী হবে এবং এর কাঠামো, শিক্ষাপদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য সেইসব কী হবে, তার খসড়া বিবরণ এখন আমাদের হাতে আছে। জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষাবিদদের সাথে কথা বলেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত খসড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে প্রথম উদ্যোক্তা হলেও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সাথে সেই পর্যায়ে কমিশন কোনো কথা বলেনি। অবশ্য সুখের বিষয়, শেষ সময়ে হলেও অন্তত আমরা এই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি।

সরকারি ধারণাপত্র

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভায় যখন যোগ দিলাম, তখন পেলাম এর কার্যপত্র। এতে যা বলা ছিল তা হচ্ছে– ২০১০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার গাজীপুর সফরকালে ওই জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। সেই মোতাবেক এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গত বছরের ৩১ মার্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে একটি চিঠি লেখা হয়। মঞ্জুরি কমিশন ২ জুন ২০১০ ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি আইন ২০১১ নামে একটি খসড়া প্রস্তুত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। ২৪ জুন ২০১০ আইনটি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়। সেই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য আবদুল হামিদকে সভাপতি করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির খসড়া নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ নভেম্বর ২০১০। সেই সভায় ধারণাপত্রটি আবার প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সেই ধারণাপত্র পাওয়ার পর ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৭২ কোটি টাকার ব্যয় প্রাক্কলন করে জানুয়ারি ১৩ থেকে জুন ১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদকাল নির্ধারণ করা হয়। ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা। সেই সভায় ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় যাদেরকে 'সুস্পষ্ট' লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গাইডলাইন, প্রয়োগিক গাইডলাইন, প্রয়োগিক পদ্ধতি এবং এর পরিধি, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রদর্শন ও কৌশল, পাঠদান ও শিক্ষা পদ্ধতি এবং এর পরিধি, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কর্ম-কৌশল ও অবয়ব ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ও কৌশলগত পরামর্শ দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সেই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ মার্চ এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই দুটি সভার কার্যপত্র থেকে আরও জানা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রকল্প ব্যয় হবে ৩৭২ কোটি টাকা। গাজীপুর জেলার গোয়ালবাথান মৌজার ৫০ একর জায়গায় এটি হওয়ার কথা। গাজীপুরের জেলা প্রশাসক জায়গা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ১২তলা ভবন, ছাত্রাবাস, আবাসিক স্থল ইত্যাদি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কার্যপত্রে একটি প্রতিবেদন যুক্ত করা হয়েছে, যাতে বলা আছে : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো: মাহবুবুল আলম জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হলেও কমিটির প্রতিবেদন না পাঠিয়ে ড. মো: মাহবুবুল আলম জোয়ার্দার স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনের সারবস্তু নিম্নরূপ :

একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাব্যবস্থার প্যারাডাইমের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে মুখস্থ পদ্ধতির চেয়ে চিন্তন, যুক্তি ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই প্যারাডাইম আয়ত্তের জন্য শিক্ষার মূল ধারায় আইসিটিকে অন্তর্ভুক্ত করা খুবই জরুরি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আইসিটি ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় বলতে বোঝায় এমন একটি সমন্বিত প্লাটফর্মকে, যেখানে শিক্ষার্থীরা কমপিউটার/মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণীর কার্যক্রম সম্পন্ন করে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে এবং যেখানে বিশেষজ্ঞ চিন্তা ও জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থা দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়ন ও আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের চিন্তনে উৎসাহিত করে সমস্যা সমাধানে যোগ্য করে গড়ে তুলবেন। এ ক্ষেত্রে আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক কথায় প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন প্যারাডাইম প্রতিষ্ঠায় খুবই সহায়ক।

ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন : ক. ক্যাম্পাস নেটওয়ার্কিং, খ. পেপারলেস পরিবেশ, গ. অফিস অটোমেশন, ঘ. দক্ষ একাডেমিক ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি। প্রতিবেদনে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো হলো : ক. নতুন প্যারাডাইম প্রতিষ্ঠায় সহায়ক, খ. সময় বাঁচায় ও সময়ের সদ্ব্যবহারে সহায়ক, গ. আইসিটিতে পশ্চাৎপদতা কমায়, ঘ. শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে ইত্যাদি।

প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি নিশ্চিত করার ধাপগুলো নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

ক. শিক্ষার্থীদের মুখস্থ না করিয়ে কোনো সমস্যা উপস্থাপন করতে হবে এবং সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে দিতে হবে, খ. শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করবে এবং তাদের চিন্তাকে প্রকাশ করবে, গ. শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করবে।

উল্লেখ্য, প্রতিবেদনটিতে শিক্ষার লক্ষ্য, প্যারাডাইম, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা ইত্যাদি উল্লেখ হলেও কোনো সুপারিশ করা হয়নি কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com